প্রথম আলো

তারিখ AUG. ২৩ 2006

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

সংবাদ বিশ্লেষণ

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি কত কাল

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ভোট ও জোটের রাজনীতি ঠিক রাখতে ক্ষমতার শেষ সময়ে এসে দুই শরিকের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে বর্তমান চারদলীয় জোট সরকারের প্রধান শরিক বিএনপি। ইসলামী ঐক্যজোটের বহুধাবিভক্ত দলগুলো যেভাবে কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি চেয়েছিল, সরকার তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিয়েছে। জামায়াতে ইসলামী যে প্রক্রিয়ায় ফাজিল-কামিলকে ডিগ্রি ও মাস্টার্সের সমমান দিতে বলেছিল, সরকার সেভাবেই বিষয়টি চূড়ান্ত করেছে। খুব শিগগির এ ঘোষণা দেওয়ার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেওয়া এ ধরনের স্বীকৃতি ও সমমানে কওমি বা আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থায় এতটুকু উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মাদ্রাসার ধর্মভিত্তিক শিক্ষার সাগরে সেই এক চিমটি ইংরেজি এবং একমুঠো বাংলা, গণিত ও বিজ্ঞান ছেড়ে দেওয়া হবে। ফলে সামগ্রিক জ্ঞানের ঘাটতি নিয়েই শেষ হবে দেশের সিংহভাগ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন। ফলে সরকারি চাকরি বা যেকোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার যত সুযোগই দেওয়া হোক না কেন, তা খুব একটা কাজে আসবে না।

কওমি মাদ্রাসার দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্স সমমান ঘোষণা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, দেশের মোট শিক্ষার্থীর ১০ থেকে ১৫ শতাংশ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করলেও সঠিক নীতিমালা ও মানের অভাবে অধিকাংশই চাকরি বা অন্যান্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রশ্ন উঠেছে, মুখে স্বীকৃতি এবং কাগজে সমমান দিলেই কি মাদ্রাসা শিক্ষার মান বেড়ে যাবে?

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৩

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি কত কাল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ উদ্যোগ মাদ্রাসা শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে নয়, মাদ্রাসাকেন্দ্রিক ধর্মীয় রাজনীতির বিকাশে সহায়ক হবে।

রাজনীতিবিদেরাও বিষয়টি যে বোঝেন না, তা নয়। কিন্তু ভোট ও রাজনীতির স্বার্থে রাজনীতিবিদেরা অনেক কিছু বুঝেও বোঝেন না। কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতি এবং আলিয়া মাদ্রাসার ফাজিল-কামিলকে ডিগ্রি ও মাস্টার্স সমমান দেওয়া এমন আরেকটি উদাহরণ হয়ে রইল। সরকার এত দিন কওমি মাদ্রাসার পড়াশোনা ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে দায়দায়িত্ব নিত না। স্বীকৃতি দেওয়ার পর পর্যায়ক্রমে সরকারের ওপর একে একে দায়িত্ব এসে পড়বে।

জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখেই কওমি মাদ্রাসার সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রায় পাঁচ বছর বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখে এবং দেওয়া হবে, হচ্ছে করে এতদিন সময়ক্ষেপণ করার পর ইসলামি রাজনৈতিক নেতাদের আর ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। নির্বাচনের আগে ধর্মীয় সহানুভূতি কাজে লাগানো, জোটের মধ্যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং সামগ্রিকভাবে ভোটারদের কাছে ইসলামের রক্ষক হিসেবে পরিচয় দেওয়ার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রায় আড়াই মাস আগে এ ধরনের স্বীকৃতি দেওয়া হলো।

মাদ্রাসা শিক্ষা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে হয়তো অনেকেরই ভিন্নমত নেই। তবে মাদ্রাসা শিক্ষা অবিচ্ছেদ্য হলেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। এর পৃষ্ঠপোষক ছাড়া সবাই মনে করছেন, এ শিক্ষা পশ্চাৎমুখী প্রক্রিয়ায় চলছে। ফলে দীর্ঘ ১৬ থেকে ১৮ বছরের পড়াশোনা করেও অধিকাংশ মাদ্রাসা-শিক্ষার্থী নিজেকে প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারছেন না।

মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের কথা সব সরকারই বলে আসছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এ বিষয়ে কেউই কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেয়নি। সব সরকারই চেষ্টা করেছে বিষয়টি পাশ কাটিয়ে যাওয়ার। এর কারণ, মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম ও রাজনীতির অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ফলে রাজনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা হয়ে উঠেছে স্পর্শকাতর বিষয়। এ সম্পর্কে স্বাধীন মত প্রকাশ করলেই 'মুরতাদ', 'কাফের' বা 'ইসলামবিরোধী শক্তি' বলে চিহ্নিত করা হয়।

কওমি স্তরের ১৮ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীকে মানবসম্পদে পরিণত করার বিষয়ে কারও খুব একটা আপত্তি ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেবল স্বীকৃতি দিলেই কি পরিবর্তনবিমুখ এই শিক্ষার মান বেড়ে যাবে? কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি ওঠার পর সরকার যে চিন্তা-ভাবনা করেছিল তাও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি কওমি মাদ্রাসাগুলোকে কিছুটা নিয়ম-নীতির আওতায় আনা হবে। কিন্তু এর পৃষ্ঠপোষকেরা স্বীকৃতি চাইলেও কোনোরকম সরকারি নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি বা আর্থিক অনুদানের পক্ষপাতী নন। সংবাদ সম্মেলন এবং সভা-সমাবেশে তারা বিভিন্ন সময় এমনও হুমকি দিয়েছেন, সরকার কওমি মাদ্রাসার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ বা নজরদারি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তারা জিহাদ শুরু করবেন।

একটি স্বাধীন দেশে কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ বা নজরদারি ছাড়া শিক্ষা চলতে পারে না। কিন্তু বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত কওমি মাদ্রাসার ওপর সরকারের কোনো নজরদারি নেই। কওমি মাদ্রাসাগুলো পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে জড়িত ইসলামি রাজনৈতিক দলের নেতারা। ইসলামি ঐক্যজোটের চারটি অংশের মধ্যে তিনটি অংশই মূলত কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকনির্ভর দল। আর এ কারণেই জোটভুক্ত ইসলামী ঐক্যজোটের দায়িত্ব ছিল, এসব শিক্ষার্থীর সনদের স্বীকৃতি আদায় করা।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের অভিভাবকেরা খাওয়া-পরার নিশ্চয়তা এবং ধর্মীয় দিক বিবেচনা করে সন্তানকে কওমি মাদ্রাসায় পাঠিয়ে থাকেন। তবে কিছু সচ্ছল অভিভাবকও ধর্মীয় বিবেচনায় সন্তানকে কওমি মাদ্রাসায় ভর্তি করান। কিন্তু এদের অনেকেই লেখাপড়া করতে এসে জড়িয়ে পড়েন রাজনীতিতে। উগ্র ধর্মীয় রাজনীতির চক্রে জড়িয়ে কেউ কেউ হয়ে ওঠেন জঙ্গি দলের সদস্য।

মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকেরা যুগ যুগ ধরে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছেন। ধর্মভিত্তিক রাজনীতিতে তারা হলেন 'দাবার ঘুঁটি'। তাদের সুশিক্ষিত করা, সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে প্রবাহিত করা, পারলৌকিকের পাশাপাশি তাদের মধ্যে জাগতিক মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা কেউ সেভাবে করেননি। তারা আত্মনির্ভর, সুশিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী হোক, এটা পৃষ্ঠপোষকদের অনেকেই চান না বলে মনে হয়। কেবল স্বীকৃতি ও সমমান বিপুল শিক্ষার্থীকে এগিয়ে না পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, সেটি বোধহয় ভেবে দেখা প্রয়োজন।